ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

"গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন ২০২৬" – এর ওপর

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)-র পর্যালোচনা ও সুপারিশ

২৪ আগস্ট ২০২৬

ভূমিকা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ আসনে প্রতিনিধিত্বকারী বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারে বলা হয়েছিল মানবাধিকার সার্বজনীন ঘোষণাপত্র অনুযায়ী মানবাধিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করা হবে এবং 'ফ্যাসিস্ট' শাসনামলে সংঘটিত গুমের ঘটনার ন্যায়বিচার ও ভবিষ্যতে বাংলাদেশে আর কোনো ব্যক্তি যেন গুমের শিকার না হয় তা নিশ্চিত করতে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত 'গুম থেকে সব ব্যক্তিকে সুরক্ষাবিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদ (আইসিপিপিইডি)' অনুসারে দ্রুত যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।[১] ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে জারি হওয়া ১৩৩টি অধ্যাদেশের মধ্যে জাতীয় সংসদের বিশেষ কমিটি কর্তৃক যাচাই–বাছাইয়ের মাধ্যমে সুপারিশকৃত ৯৭টি হুবহু এবং ১৩টি অধ্যাদেশ সংশোধনীসহ আইনে পরিণত করা হয়, যা সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য। তবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, পুলিশ কমিশন, এবং গুম প্রতিরোধসহ জনগুরুত্বপূর্ণ ১৬টি অধ্যাদেশ আইনে পরিণত না করে পরবর্তী সময়ে অধিকতর যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে নতুন করে প্রণয়ন এবং সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ ও সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় স্থাপনসহ মোট সাতটি অধ্যাদেশ রহিত করার সুপারিশ করা হয়।

জাতীয় সংসদে 'গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার অধ্যাদেশ, ২০২৫' পাশ না করার কারণ হিসেবে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে, অধ্যাদেশে কিছু অস্পষ্টতা আছে, যা সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে আলোচনাসাপেক্ষে অধিকতর যাচাই-বাছাই করে নতুনভাবে আইনটি প্রণয়ন করা হবে। এর ধারাবাহিকতায় 'গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন, ২০২৬'–এর একটি খসড়া প্রণয়ন করে ২৭ জুলাই ২০২৬ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয় এবং ২৮ জুলাইয়ের মধ্যে সর্বসাধারণের মতামত প্রদানের সময় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। তবে অংশীজনদের মতামত প্রদানের জন্য মাত্র একদিনের সময় প্রদান করা হয়, যা জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ এমন একটি আইনের ক্ষেত্রে ভুক্তভোগী ও অংশীজনদের মতামত সংগ্রহের ব্যাপারে সদিচ্ছার ঘাটতির বহিঃপ্রকাশ। পরবর্তীতে গত ৩ আগস্ট ২০২৬ তারিখে আইনের এই খসড়া মন্ত্রিপরিষদ সভায় অনুমোদন করা হয়। মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত আইনের এই খসড়ায় বেশকিছু ইতিবাচক ধারা রয়েছে, যেমন- গুমকে একটি স্বতন্ত্র ফৌজদারি ও চলমান অপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান; ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও নির্দেশদাতাদের জবাবদিহির আওতায় নিয়ে আসা; গুমের ঘটনায় রাষ্ট্রের নিরাপত্তা অথবা অন্য ধরনের অজুহাতকে অগ্রহণযোগ্য ঘোষণা ইত্যাদি যা 'গুম থেকে সব ব্যক্তিকে সুরক্ষাবিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদের (আইসিপিপিইডি)' সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

কিন্তু 'গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার অধ্যাদেশ, ২০২৫'–এর তুলনায় খসড়া 'গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন, ২০২৬'–এ এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ তারতম্য সৃষ্টি করা হয়েছে, যা গুমের প্রতিকারের ক্ষেত্রে সরকারি প্রভাবমুক্ত স্বাধীন তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার দীর্ঘকাল লালিত জনপ্রত্যাশার পরিপন্থী এবং একইসাথে গুমের শিকার হওয়া ব্যক্তি ও ভুক্তভোগী পরিবারের খসড়া আইনে প্রদত্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে। খসড়া আইনের কিছু ধারা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা গুম প্রতিরোধ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ (আইসিপিপিইডি) এবং আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে, টিআইবি মন্ত্রিপরিষদ সভায় অনুমোদিত খসড়া আইনের ওপর পর্যবেক্ষণ তুলে ধরার পাশাপাশি যথাযথ গুরুত্বসহকারে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনাসাপেক্ষে জাতীয় সংসদে বিল পাশের পূর্বে খসড়া আইনের সংশোধনের জন্য নিম্নোক্ত সুপারিশ প্রস্তাব করছে–

খসড়া আইনের প্রস্তাবনা

পর্যবেক্ষণ: ২০২৪ সালে ২৯ সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশ 'গুম থেকে সব ব্যক্তিকে সুরক্ষাবিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদের' সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার (অ্যাকসিডেড টু আইসিপিপিইডি) ফলে এবিষয়ক আইন প্রণয়ন এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ঘোষণাসহ বিভিন্ন মানবাধিকার সংক্রান্ত চুক্তির প্রতিশ্রুতি/অঙ্গীকার বাস্তবায়নের বাধ্যবাধকতার কথা এই খসড়া আইনের প্রস্তাবনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এছাড়া বাংলাদেশের সকল নাগরিকের আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার সংরক্ষণ; জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার-রক্ষণ; গ্রেপ্তারের কারণ না জানিয়ে আটক না রাখা, আইনজীবীর সাথে পরামর্শ ও আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার; যন্ত্রণা প্রদান বা নিষ্ঠুর, অমানুষিক লাঞ্ছনাকর দণ্ড প্রদান বা অনুরূপ ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকার সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার কথাও এই খসড়ার প্রস্তবনায় উল্লেখ করা হয়নি।

[১] বিএনপি, 'নির্বাচনী ইশতেহার-২০২৬', পৃষ্ঠা ১০, https://www.bnpbd.org/manifesto

সুপারিশ-১: 'গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার অধ্যাদেশ, ২০২৫' অনুসারে এই খসড়া আইনের প্রস্তবনায় সুনির্দিষ্ট করে 'গুম থেকে সব ব্যক্তিকে সুরক্ষাবিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদ, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ঘোষণা ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তির প্রতিশ্রুতি/অঙ্গীকার বাস্তবায়ন এবং বাংলাদেশের সংবিধানের এসংশ্লিষ্ট বাধ্যবাধকতার কথা উল্লেখ করতে হবে।

গুমের সংজ্ঞা (ধারা ৪)

পর্যবেক্ষণ:

- খসড়া আইনের গুমের সংজ্ঞাকে (ধারা ৪) সংকুচিত করে গুমের অপরাধে শুধুমাত্র 'সরকারি কর্মচারি' ও 'শৃঙ্খলা বাহিনী'র সদস্যদের সম্পৃক্ত হওয়ার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে খসড়া আইনে 'সরকারি কর্মচারী'র সংজ্ঞায় (ধারা ২) সরকারি কর্মচারী বলতে প্রজাতন্ত্র বা কোনো স্বায়ত্বশাসিত বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থায় কর্মে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে। ফলে আইনে জনপ্রতিনিধি/সংসদ সদস্য, মন্ত্রী, উপদেষ্টা বা রাষ্ট্রের অন্যান্য প্রতিনিধিদের গুমের অপরাধে সম্পৃক্ত হওয়ার বিষয়টিকে কোথাও সুস্পষ্ট করে চিহ্নিত করা হয়নি। উল্লেখ্য গুম সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সনদের গুমের সংজ্ঞায় বলা হয়, "রাষ্ট্রের প্রতিনিধি (এজেন্টস্ অব স্টেট) বা রাষ্ট্রের অনুমোদন, সমর্থন বা সম্মতির ভিত্তিতে কাজ করা ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর দ্বারা গ্রেফতার, আটক, অপহরণ বা অন্য কোনোভাবে স্বাধীনতা হরণ করা এবং পরবর্তীতে স্বাধীনতা হরণের বিষয়টি স্বীকার না করা অথবা আইনের সুরক্ষার বাইরে চলে যাওয়া গুম হওয়া ব্যক্তির পরিণতি বা অবস্থানের বিষয়টি গোপন করা।" গুম সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সনদের এই সংজ্ঞার পরিপূর্ণ প্রতিফলন খসড়া আইনের গুমের সংজ্ঞায় দেখা যায়নি।
- এছাড়াও আইনের সংজ্ঞায় 'ব্যাপক (Widespread)' বা 'পরিকল্পিত পদ্ধতিতে (Systematic) সংঘটিত গুম' কে সুনির্দিষ্ট করে ব্যাখ্যা করা হয়নি।

সুপারিশ-২: 'গুম থেকে সব ব্যক্তিকে সুরক্ষাবিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদের'-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে গুমের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে হবে। যাতে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে গুমের অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত সকল ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়।

সুপারিশ-৩: খসড়া আইনে উল্লিখিত 'ব্যাপক (Widespread)' বা 'পরিকল্পিত পদ্ধতি (Systematic)' বিষয়টিকে আরও সুস্পষ্ট করতে হবে।

গুমের সাজা (ধারা ৫)

পর্যবেক্ষণ: গুম থেকে সব ব্যক্তিকে সুরক্ষাবিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদে গুমকে গুরুতর অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করার কথা বলা হয়েছে। সে অনুসারে 'গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার অধ্যাদেশ, ২০২৫'-এ গুমের সাজা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা অন্যূন ১০ (দশ) বছর কারাদণ্ড এবং উক্ত দণ্ডের অতিরিক্ত অনধিক ৫০ লাখ টাকা অর্থদণ্ডের বিধান করা হয়। তবে খসড়া আইনে গুমের সাজা সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ৫০ লাখ টাকার অর্থদণ্ড অপরিবর্তীত রাখা হলেও অন্যূন কারাদণ্ড হ্রাস করে ৩ (তিন) বছর করা হয়েছে।

সুপারিশ-৪: 'গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার অধ্যাদেশ, ২০২৫' অনুসারে গুমের সাজা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা অন্যূন ১০ (দশ) বছর কারাদণ্ড এবং উক্ত দণ্ডের অতিরিক্ত অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) লাখ টাকা অর্থদণ্ডের বিধান করতে হবে।

গুমের সাক্ষ্যপ্রমাণ বিনষ্টের সাজা (ধারা ৭)

পর্যবেক্ষণ: 'গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার অধ্যাদেশ, ২০২৫'-এ গুমের সাক্ষ্যপ্রমাণ বিনষ্ট, গোপন, বিকৃত বা পরিবর্তন করার সাজা অনধিক ৭ (সাত) বছর কারাদণ্ড এবং উক্ত দণ্ডের অতিরিক্ত অনধিক ২০ (বিশ) লাখ টাকা অর্থদণ্ডের বিধান থাকলেও খসড়া আইনে সাজা হ্রাস করে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বছর করা হয়েছে।

সুপারিশ-৫: 'গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার অধ্যাদেশ, ২০২৫' অনুসারে গুমের সাক্ষ্যপ্রমাণ বিনষ্ট, গোপন, বিকৃত বা পরিবর্তন করার সাজা অনধিক ৭ (সাত) বছর কারাদণ্ড এবং উক্ত দণ্ডের অতিরিক্ত অনধিক ২০ (বিশ) লাখ টাকা অর্থদণ্ডের বিধান করতে হবে।

গোপন আটক-কেন্দ্র নির্মাণের সাজা (ধারা ৮)

পর্যবেক্ষণ: 'গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার অধ্যাদেশ, ২০২৫'-এ কোনো ব্যক্তি কর্তৃক গোপন আটক-কেন্দ্র নির্মাণ, স্থাপন বা ব্যবহারের সাজা অনধিক ৭ (সাত) বছর কারাদণ্ড এবং উক্ত দণ্ডের অতিরিক্ত ২০ (বিশ) লাখ টাকা অর্থদণ্ডের বিধান থাকলেও খসড়া আইনে সাজা হ্রাস করে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বছর কারাদণ্ড এবং উক্ত দণ্ডের অতিরিক্ত ২০ (বিশ) লাখ টাকা অর্থদণ্ডের বিধান করা হয়েছে।

সুপারিশ-৬: 'গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার অধ্যাদেশ, ২০২৫' অনুসারে আটক-কেন্দ্র নির্মাণ, স্থাপন বা ব্যবহারের সাজা অনধিক ৭ (সাত) বছর কারাদণ্ড এবং উক্ত দণ্ডের অতিরিক্ত ২০ (বিশ) লাখ টাকা অর্থদণ্ডের বিধান করতে হবে।

শৃঙ্খলা-বাহিনীর সদস্য নয় এমন ঊর্ধ্বতন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিশেষ বিধান (ধারা ১১)

পর্যবেক্ষণ:

- খসড়া আইনের এই ধারায় 'শৃঙ্খলা-বাহিনীর সদস্য নয় এমন ঊর্ধ্বতন ব্যক্তি' হিসেবে কাদের বিবেচনা করা হবে, সে বিষয়টি সুস্পষ্ট করা হয়নি।
- খসড়া আইনের ধারা ১০-এ শৃঙ্খলা-বাহিনীর ক্ষেত্রে বিশেষ বিধান হিসেবে বলা হয়, শৃঙ্খলা-বাহিনীর কোনো ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, কমান্ডার বা দলনেতা যদি ধারা ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯ এ উল্লিখিত গুম সংক্রান্ত যেকোনো অপরাধ সংঘটনে অধস্তনদের আদেশ, অনুমতি, সম্মতি, অনুমোদন বা প্ররোচণা দেন অথবা উক্ত অপরাধে নিজেই অংশগ্রহণ করেন তাহলে তিনি মূল অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। কিন্তু 'শৃঙ্খলা-বাহিনীর সদস্য নয় এমন ঊর্ধ্বতন ব্যক্তি'র ক্ষেত্রে এরূপ কোনো বিধান রাখা হয়নি। ফলে কোনো ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মচারী বা দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী বা রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বতন কোনো প্রতিনিধি বা অন্য কোনো ব্যক্তি এ ধরনের অপরাধ সংঘটনে অধস্তনদের আদেশ, অনুমতি, সম্মতি, অনুমোদন বা প্ররোচনা দিলে তাদের ক্ষেত্রে এই ধারা কার্যকর হবে না।

  সুপারিশ-৭: এই ধারায় 'শৃঙ্খলা-বাহিনীর সদস্য নয় এমন ঊর্ধ্বতন ব্যক্তি' হিসেবে কাদের বিবেচনা করা হবে, সে বিষয়টি সুস্পষ্ট করতে হবে। এবং এক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধি ও নির্বাহী বিভাগের যে কেউ (যেমন: রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রশাসনের বা অন্য কোনো দপ্তরের ঊর্ধ্বতন ব্যক্তি) এর অন্তর্ভুক্ত হবে তা সুস্পষ্ট করতে হবে।

  সুপারিশ-৮: খসড়া আইনের ধারা ১০-এর মতো করে 'শৃঙ্খলা-বাহিনীর সদস্য নয় এমন ঊর্ধ্বতন ব্যক্তি যদি ধারা ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯ এ উল্লিখিত যেকোনো অপরাধ সংঘটনে অধস্তনদের আদেশ, অনুমতি, সম্মতি, অনুমোদন বা প্ররোচনা দেন অথবা উক্ত অপরাধে নিজেই অংশগ্রহণ করেন তাহলে তিনি মূল অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ডে দণ্ডিত হবেন'-এই বিধান যুক্ত করতে হবে।

গুমের অপরাধ সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের, তদন্ত ও আমলে গ্রহণ (ধারা ১৪)

পর্যবেক্ষণ:

- 'গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার অধ্যাদেশ, ২০২৫'-এ গুমসংক্রান্ত তথ্য বা অভিযোগ গ্রহণ, গুমের অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনা, ইত্যাদি কার্যক্রম জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের এখতিয়ারভুক্ত ছিল। তবে খসড়া আইনে সংশ্লিষ্ট থানার অফিসার ইনচার্জকে সংঘটিত গুমের অপরাধের ক্ষেত্রে অভিযোগ গ্রহণ ও তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। থানার অফিসার ইনচার্জ অভিযোগ গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে এখতিয়ারসম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে নালিশি মামলা দায়েরের বিধান যুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশে ইতিপূর্বে সংঘটিত অধিকাংশ গুমের ঘটনায় শৃঙ্খলা বাহিনীর সম্পৃক্ততা লক্ষ করা যায় এবং এই খসড়া আইনের সংজ্ঞায় সুস্পষ্টভাবে শৃঙ্খলা-বাহিনীকে গুম সংক্রান্ত অপরাধে সম্ভাব্য অভিযুক্ত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শৃঙ্খলা বাহিনীর গুম সংক্রান্ত অপরাধ বিশেষ করে শৃঙ্খলা বাহিনীর ঊর্ধ্বতন ব্যক্তি কর্তৃক সংঘটিত অপরাধের অভিযোগ গ্রহণ ও তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব শৃঙ্খলা বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত পুলিশ বাহিনীর একজন সদস্যকে দেওয়া হলে তা মারাত্মকভাবে স্বার্থের দ্বন্দ্ব তৈরি এবং স্বাধীন তদন্ত ব্যাহত হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি করবে। খসড়া আইনের এই ধারা শুধুমাত্র স্বাধীন ও প্রভাবমুক্ত তদন্ত কার্যক্রমকে ব্যাহত করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে প্রস্তুতকৃত মিথ্যা তদন্ত প্রতিবেদন আইনে প্রদত্ত গুমের শিকার হওয়া ব্যক্তির স্বীকৃতি, ক্ষতিপূরণ, ভুক্তভোগীর পরিবারের সম্পত্তির ব্যবহার ও উত্তরাধিকারসংক্রান্ত অধিকার পাওয়া থেকেও বঞ্চিত করবে। একইসাথে ভুক্তভোগী বা তার পরিবারের অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত করার মাধ্যমে উল্টো অভিযোগকারীকে ৫ বছরের কারাদণ্ডের সাজা ভোগ করানোর সুযোগ তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। ফলে এই আতঙ্ক থেকে অনেকে অভিযোগ করা থেকে বিরত থাকবে।
- খসড়া আইনে গুম সংক্রান্ত কোনো অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর কেউ অভিযোগ না করলে স্বপ্রনোদিত হয়ে গুমসংক্রান্ত অপরাধের তদন্তের কোনো সুযোগ রাখা হয়নি।
- 'গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার অধ্যাদেশ, ২০২৫'-এ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকারের জন্য বিভিন্ন কার্যাবলীর কথা উল্লেখ করা হয় যার মধ্যে ছিল বিভিন্ন আইনে আটকসম্পর্কিত রক্ষাকবচসমূহের প্রতিপালন পর্যবেক্ষণ; কারাগার, হাজতখানা ও আটককেন্দ্রসহ যে-কোনো স্থান ও স্থাপনা সরেজমিন পরিদর্শন; গোপন আটক কেন্দ্র শনাক্ত করার উদ্দেশ্যে যেকোনো স্থাপনা পরিদর্শন ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ; কোনো ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে দলিলাদি বা তথ্য সংগ্রহ; গুম প্রতিরোধ ও দমনের উদ্দেশ্যে শিক্ষা, গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা; গুমসংক্রান্ত সকল অভিযোগের তথ্য রেজিস্টার আকারে সংরক্ষণ; মামলা দায়েরসহ প্রয়োজনীয় যেকোনো আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ; গুম হওয়া ব্যক্তি ও তার স্বজনদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ; কর্তব্যে গাফলতির ক্ষেত্রে দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ; গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড ও গুমের শিকার ও ভুক্তভোগীদের কল্যাণে তহবিল পরিচালনা করা ইত্যাদি। কিন্তু খসড়া আইনে এধরনের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। সুনির্দিষ্টভাবে এই খসড়ায় গুম প্রতিরোধ সংক্রান্ত কোনো ধারা অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

সুপারিশ-৯: গুমের অপরাধের ক্ষেত্রে স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করতে 'গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার অধ্যাদেশ, ২০২৫'-এর ন্যায় গুমের অপরাধ সম্পর্কিত অভিযোগ গ্রহণ, গুমের অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনাসহ উল্লিখিত কার্যক্রম পরিচালনার এখতিয়ার জাতীয় মানবাধিকার কমিশনারের ওপর ন্যস্ত করতে হবে।

শৃঙ্খলা-বাহিনীর কোনো ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার গুম সংক্রান্ত অপরাধের ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তীকালীন তদন্ত প্রতিবেদন (ধারা ১৫)

পর্যবেক্ষণ:

- খসড়া আইনে শৃঙ্খলা-বাহিনীর কোনো ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার গুম সংক্রান্ত অপরাধের ক্ষেত্রে [ধারা ১০ এর (গ) ও (ঘ) এর অধীন অপরাধ] এখতিয়ারসম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক তদন্তকারী কর্মকর্তাকে শুধুমাত্র উক্ত বিষয়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ প্রদান এবং উক্ত ঊর্ধ্বতন ব্যক্তির বিরুদ্ধে সন্তোষজনক কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ না থাকলে তাকে কার্যধারা থেকে অব্যাহতি দেওয়ার আদেশ প্রদানের বিধান যুক্ত করা হয়েছে। 'গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার অধ্যাদেশ, ২০২৫'-এ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের নিযুক্ত তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক এই অন্তর্বর্তীকালীন তদন্ত প্রতিবেদন তৈরির বিধান ছিল। তবে খসড়া আইনের ধারা ১৪ অনুযায়ী তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসেবে এই অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন তৈরি করবেন শৃঙ্খলা বাহিনীর একজন কর্মকর্তা। বিদ্যমান বাস্তবতায় অধস্তন একজন তদন্তকারী কর্মকর্তার পক্ষে তার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার বিপক্ষে "অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন" প্রস্তুত ও দাখিল করার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা কতটুকু সম্ভব হবে তা প্রশ্নসাপেক্ষ। একইসঙ্গে এই তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সন্তোষজনক কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া না গেলে এখতিয়ারসম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ঊর্ধ্বতন ব্যক্তিকে কার্যধারা থেকে অব্যাহতি দেওয়ার বিধান যুক্ত করার ফলে কার্যত গুম সংক্রান্ত অপরাধে সম্পৃক্ত শৃঙ্খলা বাহিনীর ঊর্ধ্বতন ব্যক্তিকে দায়মুক্তি দেওয়ার ঝুঁকি তৈরি করেছে।
- অন্তর্বর্তীকালীন তদন্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন শুধুমাত্র শৃঙ্খলা বাহিনীর ঊর্ধ্বতন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করা হয়েছে। শৃঙ্খলা-বাহিনীর সদস্য নয় এমন ঊর্ধ্বতন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য করা হয়নি।

সুপারিশ-১০: স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করতে 'গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার অধ্যাদেশ, ২০২৫'-এর ন্যায় গুমের অপরাধ সম্পর্কিত অভিযোগ গ্রহণ, গুমের অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনার এখতিয়ার জাতীয় মানবাধিকার কমিশনরের ওপর ন্যস্ত করতে হবে। এবং কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত তদন্ত কর্মকর্তা শৃঙ্খলা বাহিনীর ঊর্ধ্বতন ব্যক্তি বা শৃঙ্খলা-বাহিনীর সদস্য নয় এমন ঊর্ধ্বতন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই অন্তর্বর্তীকালীন তদন্ত প্রতিবেদন তৈরি করবেন।

গুম হওয়া ব্যক্তির সন্ধান প্রক্রিয়া এবং অনুসন্ধানে তল্লাশি পরোয়ানা জারি (ধারা ১৬)

পর্যবেক্ষণ: 'গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার অধ্যাদেশ, ২০২৫'-এ যতদিন না গুম হওয়া ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া বা তার পরিণতি সম্পর্কে জানা যাবে, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক ততদিন পর্যন্ত সন্ধান চালিয়ে যাওয়া এবং প্রতি তিন (৩) মাস অন্তর একটি অগ্রগতি প্রতিবেদন অভিযোগকারী ও গুম হওয়া ব্যক্তির পরিবারকে অনুলিপি পাঠানোর বিধান থাকলেও খসড়া আইনে তা অনুপস্থিত।

সুপারিশ-১১: গুম সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সনদ অনুযায়ী সকল ভুক্তভোগীর সত্য জানার অধিকার সুরক্ষিত করতে ২০২৫-এর অধ্যাদেশের ন্যায় যতদিন না গুম হওয়া ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যাবে বা তার পরিণতি সম্পর্কে জানা যাবে, ততদিন পর্যন্ত তার সন্ধান চালিয়ে যাওয়া এবং প্রতি তিন (৩) মাস অন্তর একটি অগ্রগতি প্রতিবেদন অভিযোগকারী ও গুম হওয়া ব্যক্তির পরিবারকে পাঠানোর বিধান খসড়া আইনে যুক্ত করতে হবে।

সাজা লাঘব বা বৃদ্ধির পরিস্থিতি (Mitigating or aggravating factors) (ধারা ১৭)

পর্যবেক্ষণ: খসড়া আইনের ধারা ১৭ (২) (খ) এবং (৪) (খ)-এ গুম সম্পর্কিত কোনো অপরাধের দণ্ড প্রদানের ক্ষেত্রে "আদালত কর্তৃক বিবেচিত অন্য কোনো যুক্তিসঙ্গত পরিস্থিতি" বিবেচনায় সাজা লাঘব বা বৃদ্ধির বিধান করা হয়েছে। ধারাটির অস্পষ্টতার ফলে বিচারকের ব্যক্তিক বিবেচনা প্রয়োগ বা কোনো বিশেষ মহলের চাপে সাজা কমিয়ে দেওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হতে পারে।

সুপারিশ-১২: খসড়া আইনের ধারা ১৭ (২) (খ) এবং (৪) (খ)-এ "আদালত কর্তৃক বিবেচিত অন্য কোনো যুক্তিসঙ্গত পরিস্থিতি" বিষয়টির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে হবে অর্থাৎ কোন কোন যুক্তিসঙ্গত পরিস্থিতিতে আদালত সাজার বিষয়টি বিবেচনা করবে তা সুস্পষ্ট করতে হবে।

মিথ্যা মামলার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা (ধারা ২১)

পর্যবেক্ষণ: খসড়া আইনে সকল অপরাধের সাজা হ্রাস করা হলেও গুমের অভিযোগ মিথ্যা ও হয়রানিমূলক বলে প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট অভিযোগ দায়েরকারী ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ দানের পাশাপাশি অভিযোগ দায়েরকারী ব্যক্তির সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান বৃদ্ধি করে অনধিক ৫ (পাঁচ) বছর করা হয়েছে। যদিও 'গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার অধ্যাদেশ, ২০২৫'-এ এই দণ্ড ছিল অনধিক ২ (দুই) বছর। খসড়া আইনে গুমের অপরাধের সাজা হ্রাস করে অন্যূন ৩ বছর করা হলেও মিথ্যা বা হয়রানিমূলক অভিযোগের সাজা ৫ বছর করা হয়েছে। যা অভিযোগ দায়ের করার ক্ষেত্রে ভুক্তভোগী ও তার পরিবারের মধ্যে ভীতির সৃষ্টি করতে পারে। শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের গুম সংক্রান্ত অপরাধের তদন্তের দায়িত্ব পুলিশ বাহিনীর সদস্যকে দেওয়া হয়েছে, ফলে স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রভাবে দুষ্ট উদ্দেশ্যপ্রণোদিত দুর্বল তদন্ত ও যথাযথ সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে অভিযোগকারী ভুক্তভোগীর পরিবার সাজার সম্মুখীন হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে।

> **সুপারিশ-১৩:** 'গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার অধ্যাদেশ, ২০২৫'-এর ন্যায় কোনো মামলা যদি মিথ্যা বা হয়রাণিমূলক প্রমাণিত হয় তাহলে এর সর্বোচ্চ শাস্তি অনধিক ২ (দুই) বছর করতে হবে। এক্ষেত্রে গুমের অপরাধ সম্পর্কিত অভিযোগ গ্রহণ, গুমের অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনার এখতিয়ার মানবাধিকার কমিশনারের ওপর ন্যস্ত করতে হবে।

ভুক্তভোগীর চিকিৎসা, পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ তহবিল (ধারা ৩০)

পর্যবেক্ষণ: 'গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার অধ্যাদেশ, ২০২৫'-এ গুমের শিকার ব্যক্তি ও ভুক্তভোগীর পরিবারের চিকিৎসা, পুনর্বাসন, ক্ষতিপূরণ ও আইনগত সহায়তার জন্য তহবিল গঠন, অর্থ সংগ্রহ ও ব্যয়ের এখতিয়ার জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ওপর ন্যাস্ত থাকলেও খসড়া আইনে তা 'সরকার'-এর হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। তবে এই তহবিল সরকারের কোন মন্ত্রণালয় বা দপ্তরের অধীনে থাকবে তা সুস্পষ্ট করা হয়নি। যার ফলে গুমের শিকার ব্যক্তির চিকিৎসা, পুনর্বাসন, ক্ষতিপূরণ ও আইনগত সহায়তা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে এবং এই সহায়তা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনা ও পক্ষপাতিত্বের ঝুঁকিও সৃষ্টি হয়েছে।

> **সুপারিশ-১৪:** 'গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার অধ্যাদেশ, ২০২৫'-এর ন্যায় গুমের শিকার ব্যক্তির চিকিৎসা, পুনর্বাসন, ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত তহবিল গঠন ও ব্যয়ের এখতিয়ার জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ওপর ন্যস্ত করতে হবে।

গুম সংক্রান্ত অপরাধের বিচার কার্যক্রম (ধারা ১৯)

পর্যবেক্ষণ: 'গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার অধ্যাদেশ, ২০২৫'-এ গুম সংক্রান্ত অপরাধ আমলে নেওয়া ও বিচার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রত্যেক বিভাগ বা জেলায় ভৌগোলিক অধিক্ষেত্র নির্ধারণপূর্বক এক বা একাধিক গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার ট্রাইব্যুনাল গঠনের বিধান করা হলেও খসড়া আইনে এখতিয়ারসম্পন্ন দায়রা জজ আদালতে এই বিচার কার্যক্রম পরিচালনার কথা বলা হয়েছে। দায়রা জজ আদালতের ওপর বিচার কার্যক্রম সমাপ্ত করার বাধ্যবাধকতা তৈরির মাধ্যমে মামলা জট তৈরির ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে।

> **সুপারিশ-১৫:** বিচার কার্যক্রমে দীর্ঘসূত্রতা ও মামলা জট কমাতে গুম সংক্রান্ত অপরাধের বিচার কার্যক্রম পরিচালনা করতে পৃথক গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার ট্রাইব্যুনাল গঠন করতে হবে। এর গঠন, কার্যপরিধি ও এখতিয়ার 'গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার অধ্যাদেশ, ২০২৫'-এর আলোকে সুনির্দিষ্ট করতে হবে।

গুমসংক্রান্ত তথ্যভাণ্ডার তৈরি ও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন (ধারা ৩২)

পর্যবেক্ষণ: 'গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার অধ্যাদেশ, ২০২৫'-এ গুমসংক্রান্ত তথ্যভাণ্ডার তৈরি করা ও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের দায়িত্ব জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ওপর ন্যস্ত করা হলেও খসড়া আইনে কে এই কার্যক্রম পরচিালনা করবে সে বিষয়টি সুস্পষ্ট করা হয়নি।

> **সুপারিশ-১৬:** 'গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার অধ্যাদেশ, ২০২৫' -এর ন্যায় গুমসংক্রান্ত তথ্যভাণ্ডার তৈরি করা ও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের দায়িত্ব জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ওপর ন্যস্ত করতে হবে।

প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা

পর্যবেক্ষণ: 'গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার অধ্যাদেশ, ২০২৫'-এ সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করা হলেও খসড়া আইনে এই সুযোগ রাখা হয়নি।

> **সুপারিশ-১৭:** 'গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার অধ্যাদেশ, ২০২৫'-এর ন্যায় আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করতে হবে।

****